গুরু বন্দ্যোপাধ্যায়

'শব্দের বিবেক' : কানেত্তির সাহিত্য দর্শন

শিরোনামের নাম শব্দটি এই শতকের সাহিত্য সংসারে একজন অপ্রতিষ্ঠিত লেখকের নাম। তাঁর মুখ্য পরিচয় বর্তমানে এই যে তিনি ১৯৮১-তে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর দুর্ভাগ্য যে এইটাই তাঁর এখন মুখ্য পরিচয়, অথচ তাঁর যা প্রকৃত পরিচয়—লেখকদের রাজ্যে অসাধারণ বৈদগ্ধ্যে তিনি এক প্রবল মনীষা— এখনো আমরা জ্ঞাত হইনি। তিনি অপ্রতিষ্ঠিত ও উপেক্ষিত কারণ তিনি তথাকথিত সৃজনশীল সাহিত্য রচনার চেয়ে চিন্তার ক্ষেত্রেই মৌলিকভাবে সৃজনশীল হতে চেয়েছেন। অতিখ্যাত, অল্পখ্যাত অধিকাংশ লেখকের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে কানেত্তির ক্ষেত্রে আদৌ তা ঘটে না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় লেখকদের মধ্যে কাজ করে একটা বিশেষ ঝোঁক (নান্দনিক পরিভাষায় হয় তো প্রেরণা) যা তাঁদের টেনে নিয়ে চলে গল্প-উপন্যাস-নাটকের নানা খাতে আর এইসব খাতে যখন তাঁদের কলম চলে তখন তাঁদের মনের গভীরে বিচারশীল ও চেতনে জাগ্রত সন্ধানী চিন্তা যত না কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে তাঁদের ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ওই সমস্ত ইন্দ্রিয়-সৃষ্ট ছাপজট। এই মনোধর্মানুসারী প্রক্রিয়ায় যা লেখা হয় তা তাৎক্ষণিকভাবেই পাঠক সাধারণের কাছে বোধগম্য হয়ে থাকে বলে লেখকে পাঠকে সম্বন্ধটা হয় মিত্রতার, ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বে যাকে মনোরমভাবে বলা হয়েছে 'সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য'— পরিস্থিতি। কিন্তু এমন কোনো লেখক যদি থাকেন যাঁকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর মনোগঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, যিনি গল্প-উপন্যাস-নাটক তৈরির তাগিদে লিখতে বসেন না বরং যাঁর সৎ চিন্তাশীলতা এবং চিন্তাশীল সততা অনিবার্যভাবে অমোঘ টানে 'শব্দের বিবেকে' এসে পৌঁছয়, তাঁর ভাগ্যে কী ঘটবে ? যে লেখকের ওই মনোধর্মের কারণে পাঠকের সঙ্গে হবে না সহজ সখ্য, বরং পাঠকের সঙ্গে তাঁর হবে কঠিন চিন্তা-দ্বৈরথের সম্বন্ধ, সেই লেখকের ভবিতব্য কী ? এইসব প্রশ্নের উত্তর ইলিয়াস কানেত্তি। কারণ কানেত্তি লেখকদের মধ্যে মনোধর্মে ব্যতিক্রম ; কারণ কানেত্তি-র সঙ্গে পাঠকের মিত্রতা নয়, দ্বন্দ্ব ; কারণ কানেত্তি তথাকথিত সৃজনশীল সাহিত্যের লেখক নন কিন্তু যাঁর সৃজনশীল চিন্তার থেকে নিঃসৃত 'শব্দ-বিবেক' সৃষ্টি করেছে কথা সাহিত্যের নতুন সম্ভাবনা। তাই কানেত্তি সুদীর্ঘকাল অনাদৃত, অস্বীকৃত এবং অপ্রতিষ্ঠিত তো বটেই। ইউরোপে তিনি প্রায় অপরিচিত এবং আমাদের দেশে অজ্ঞাত কুলশীল। লেখক

হিসেবে কানেত্তি-র একমাত্র পরিচয় তিনি বিদগ্ধ পুরুষ। অনেক কালজয়ী লেখক বৈদগ্ধ্যে সামান্য মানুষ। [যেমন ছোট গণ্ডীতে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রেমচন্দ, সমরেশ বসু বড় গণ্ডীতে ডিকেন্স]। অনেক সামান্য লেখক বৈদগ্ধ্যে অসামান্য ; কানেত্তি ওই দুই শ্রেণীর কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তাঁর মধ্যে অসামান্য বৈদগ্ধ্য থেকে জন্ম হয়েছে এক অসাধারণ লেখকের। অবিদগ্ধ লেখক কালজয়ী শিল্প প্রতিভার অমরত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। কালজয়ী শিল্প প্রতিভার ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। আবার অসামান্য বৈদগ্ধ্যর থেকে অনিবার্যভাবে একজন অসাধারণ লেখকের আত্মপ্রকাশ নাও ঘটতে পারে। তাই এমন ব্যক্তি সাহিত্য জগতে বিশেষ কোনো স্বীকৃতি পাবেন না, এটাও নিয়ম। কিন্তু সাহিত্য জগতে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে আশ্চর্যের তা হল বিদগ্ধ পুরুষ যদি শক্তিমান সাহিত্যিক হন তো তাঁর প্রাপ্য দণ্ড। এই আশ্চর্য নিয়মটার উৎস অবশ্য পাঠককুলের মনোজগৎ ! পাঠক চিন্তাশীল মনীষীকে ভয়ে ভয়ে ভক্তি করেন কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, মনীষী প্রাবন্ধিক হিসাবে বিশেষ সমীহ করেন। এই পাঠকই আবার গল্প-উপন্যাস-নাটকের সাহিত্য শিল্পীকে, 'স্বভাব কবি'-কে নিজের মনের মানুষের মতো ভালবাসেন ; আজীবন নিরন্তর চলে তাঁদের সঙ্গে প্রেম ও প্রণয়। সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত তাই রাসেল এবং উপন্যাস-প্রবন্ধকার সার্ত্র-ও। এবং অন্য দিকে শপ্যাঁ, ভ্যান গগ বা পল রোবসনের মতো ডি.এইচ লরেন্স, মোরাভিয়া, পাস্তেরনাক, হেমিংওয়ে ইত্যাদি। আমরা পাঠক হিসাবে ছাড়পত্র দিই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়কে কিংবা বুদ্ধদেব বসুকে। সাহিত্যের জগতে দুটি মাত্র বাতিঘর— মনীষার জ্যোতি কিংবা শিল্পের দ্যুতি। আলোর বৃত্তে অধিষ্ঠিত তাই মনীষী আর আর্টিস্ট বা কথাশিল্পী। আর সকলে অন্ধকারে, অপরিচয়ের অন্ধকারে। সমকালীন সাহিত্যে কানেত্তি-ও এই অন্ধকারে এতদিন অজ্ঞাত ছিলেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী নিষ্ঠাবান শ্রমিকের মতো যিনি সৃজনধর্মী কথা সাহিত্যে প্রতিটি শব্দ রচনা তীক্ষ্ণ করেছেন প্রতিভাদীপ্ত কলমে তাঁর অসাধারণ মৌলিক চিন্তা-মনীষার মুক্তির প্রেরণায় সেই কানেত্তি বরাবরই অজ্ঞাত সাহিত্য কর্মী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ নজির, যিনি বিশুদ্ধ প্রেরণা নির্ভর বাগ্‌বিস্তারে কিংবা চিন্তামুক্তির একমাত্র উপায় হিসাবে মননশীল প্রবন্ধের গণ্ডীটুকুতে আবদ্ধ থাকতে বিশ্বাসী নন। বরং তিনি বরাবর মনে করে এসেছেন যে চিন্তামুক্তির পদ্ধতি প্রয়োজনমতো প্রবন্ধ হলেও বিশুদ্ধ, পরিশীলিত মনন স্রোতের মন্থনে বিচারসিদ্ধ চিন্তাগুলির ব্যাপকতর ও গভীরতর রূপায়ণের পদ্ধতি হল গল্প-উপন্যাস-নাট্যসৃষ্টি। কথা সাহিত্যের একটি মাত্র উপাদান তিনি স্বীকার করেন এবং তা হল বিশুদ্ধ চিন্তাশীলতা বা মনন ক্রিয়া। চিন্তাকে বহন করার জন্যই গল্প বা উপন্যাস বা নাটক। এগুলির অন্যবিধ সার্থকতা নেই। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলাফল তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অবশ্যই মারাত্মক হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সৃষ্টি তাঁর বজ্রমাণিক থেকে হীরের জ্যোতি আমাদের চোখে পড়েনি। এমনি অন্ধকারে অন্তরীণ থাকতেন কানেত্তি হয়ত

চিরজীবন কিন্তু সম্প্রতি, ১৯৮১-তে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় আলোচনার বিষয় হয়েছেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে অনেক সময়ে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন, নোবেল পুরস্কার, অনেক সময়েই অবহেলিত প্রতিভা-কে জনমানসে উদ্ধার করে আনে। কোনো কোনো অক্ষম সাহিত্যকার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ঠিক সেই সময়েই বা তার আগে পরে প্রতিভাধর সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কারের আওতার বাইরে থেকে গেছেন— কিপলিং নোবেল লরিয়েট অথচ টমাস হার্ডি এই পুরস্কারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, এরকম সব ব্যাপার সত্ত্বেও কিংবা অনেক ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের প্রাপক নির্ধারণে সাহিত্যের চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচারাবিবেচনায় এই পুরস্কারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলেও, সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুরস্কারের এটাই সবচেয়ে বড় অবদান যে অনেক সময়ে সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টির রথের চক্র-নির্ঘোষ যখন আমাদের কানে এসে পৌঁছয় না তখন নোবেল পুরস্কারের ভেঁপু বাজলে সাহিত্যের দ্রষ্টা সম্বন্ধে সচকিত হয়ে উঠি। অন্তত আমাদের দেশে নোবেল পুরস্কারের এই ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের কাল থেকে এখনো পর্যন্ত এ কথা সত্য।

কানেত্তি আমাদের কাছে অপরিচিত। তাই তাঁর কিছু প্রাথমিক পরিচয় প্রয়োজন। আর তাঁর পরিচিতি রচনা বেশ সহজতর কাজ কারণ তাঁর নিজস্ব জীবন অনেকাংশেই তাঁর লেখক পরিচিতি। এমন কি তাঁর মুখবন্ধরূপ তাঁর লেখক চরিত্রের কিছুটা পরিচয় বহন করে। কথাটা অর্থহীন মনে হবে না যদি কনফুশিয়াসের একটি উক্তি অগ্রাহ্যের বস্তু না হয়। কনফুশিয়াস একবার বলেছিলেন যে কোনো একজন মানুষ যতই রূপবান হোক না কেন সে যদি প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্যও চিন্তনে মননে নিরত না থাকে তো তাকে বড় কুৎসিত দেখায়। অর্থাৎ, অন্যভাবে, মননশীল মানুষের মুখে একটা বিশেষ রূপ সৃষ্টি হয়—তা সে মানুষের দৈহিকরূপ যেমনই হোক না কেন, সুন্দর অথবা অসুন্দর। অবশ্য কনফুশিয়াস যে রূপসৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন তা একটু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যাপার। তাই কানেত্তির মুখের দিকে তাকালে আমাদের চিন্তাহীন চোখে তাঁর আসল পরিচয় হয়ত উদ্ঘাটিত হবে না, হয়ত শুধুই আশ্চর্য হব যে ছিয়াত্তর বছরের একজন মানুষের মুখ কোন রহস্যে এমন দুঢ় চোয়ালে আঁটসাট রাগী জোয়ান হয়? বস্তুত একজন মানুষ কয়েক দশক ধরে নিরন্নত্তর পড়াশোনা ও মননচিন্তনের কঠোর শ্রমে বদরাগীর চেহারা নিতে পারেন গড় মানুষের চোখে যার মনে কোনো পলি জমে নি, কিন্তু অনুশীলিত মানুষ জানেন ওই বদরাগের চেহারা আসলে এক রহস্যময় মুখোশ যাকে কনফুশিয়াস ঠিক চিনতে পারতেন কষ্টার্জিত বৈদগ্ধ্যের কান্তিরূপ। শুধু অ্যাকাডেমি ব্যক্তিত্বের বৈভবই নয় তাঁর যে অনমনীয় চোখ দুটি দেখে মনে হয় তিনি বুঝিবা কোনো এক কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি, বস্তুত সেই চোখে আছে এক সুগভীর কাল-চেতনা, যে কালচেতনায় সৃষ্টি হয় ঐশ্বর্যময় এক অন্ধত্ব—অতি প্রখর দৃষ্টির অন্তরালে

আছে জীবন উপলব্ধির মৌলিক অন্বয়, তাঁর নিজের কথায় : "Blindness is a weapon against time and space ; our being is one vast blindness, save only for that little circle which our mean intelligence—mean in its nature as in its scope...can illumine. The dominating principle of the universe is blindness. It makes possible juxtapositions which would be impossible if the objects could see each other. It permits the turncation of time when time is unendurable. Time is a continuum whence there is one escape only. By closing the eyes to it from time to time....." স্বভাবতঃই সাহিত্যে চিরাচরিত চিন্তাভাবনার চৌহদ্দিতে এমন মানুষ বড় অস্বস্তিকরভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবার পর একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই আমাদের মনে হয় শুধুমাত্র নোবেল পুরস্কারই নয়, অনেক নোবেল পুরস্কার-প্রাপকের কপালে যা জোটেনি, আমাদের বিশেষ মনোযোগই এঁর চূড়ান্ত প্রাপ্যবস্তু। কানেত্তি-র সাহিত্যে যে বিচিত্র ঐশ্বর্য তার বাস্তব ভিত্তি হচ্ছে তাঁর জীবনের বৈচিত্র্য। বুলগেরিয়ায় ১৯০৫ সালে তাঁর জন্ম। পিতামাতার সূত্রে স্পেনীয়। জন্মগত ভাষা স্প্যানিশ কিন্তু তাঁর ছয় বছর বয়সের সময়ে তার পিতামাতা চলে আসেন ইংলন্ডে, সেখানে ইংরেজি ভাষা-পরিবেশে কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তাঁর পিতার অকালমৃত্যুতে তাঁরা চলে আসেন ভিয়েনায় এবং সেই থেকে তাঁর জীবন-বিকাশের ভাষা হয় জার্মান এবং জার্মান ভাষাতেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। ইউরোপীয় সংস্কৃতি তাঁর মানসে এইভাবে প্রবাহিত হয় স্প্যানিশ-ইংরেজি-জার্মান ভাষার ত্রিস্রোতায়। তাঁর বিদ্যালয় জীবন কাটে জুরিখে (সম্ভবত) এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে। ১৯২৪ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবন শুরু হয়, ১৯২৯ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিজ্ঞানে ডক্টরেট লাভ করেন। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী-কালে আরম্ভ হয় তাঁর সাহিত্যজীবন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লেখক কানেত্তি প্রধানত ভিয়েনাবাসী। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ফ্রাঙ্কফুর্টে, ভিয়েনায় সামাজিক জীবনে যে চাপ সৃষ্টি হয়, যে-সব গণআন্দোলনের তরঙ্গ ওঠে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করেন গণমনের চরিত্র। ১৯৩৮ সালে ইংলন্ডে অভিবাসিত হয়ে সেই থেকে তিনি ইংলন্ডের নাগরিক। কানেত্তি লেখাপড়া করেন ও মৌখিকভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেন জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান ও ইংরেজিতে। তাঁর আগ্রহের পরিসরও একটু বেশি বিস্তৃত। তবে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র মূলত নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অনিবার্যভাবে দর্শন। তিনি নিজেই বলেছেন যে এতরকম বিষয়ে আগ্রহী হওয়া হয়ত বেমানান ব্যাপার কিন্তু তাঁর কাছে ওই বিষয়-গুলির সব কয়টিই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সমস্ত বিষয়ের পিছনে বছরের পর বছর কঠোর শ্রম নিয়োগ করে তিনি কয়েক দশক ব্যয় করে ফেলেছেন। কানেত্তি হয়ত

সৌজন্যবশতই বলেননি যে কোনো নিষ্ঠাবান চিন্তাবিদের পক্ষে জ্ঞানের অবিভাজ্যতার নিয়মে এই রকমের অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক ব্যাপার। তথাকথিত সাহিত্য স্রষ্টারা চিন্তার দায়মুক্ত, তাই তাঁদের জীবনও অধ্যয়নের ভার মুক্ত। আর তথাকথিত চিন্তাবিদরা ছদ্ম-পণ্ডিত বলে পল্লবগ্রাহী জীবন বেশ আরামেই কাটিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কানেত্তি এঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যবোধের মানুষ তাই বিদ্যার জন্য আজীবন কঠোর শ্রমই তাঁর বিধিলিপি।

১৯৩৫ সালে কানেত্তি রচনা করেন একটি উপন্যাস, Die Blendung The Deception / বঞ্চনা। গণমনের প্রকৃতি ও মানব সংস্কৃতি এই দুইয়ের অনুসন্ধানে বছরের পর বছর নিযুক্ত থেকে এই উপন্যাসের মধ্যে, তাদের পারস্পরিক সংঘাতের পুরো কাঠামোটা গড়ে তুললেন। স্রষ্টা পুরুষ তরুণ বয়সেই এমন এক সংকটের উদ্ঘাটন করেছেন যা মুক্ত চিন্তার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে দেয়। আর এই উপন্যাসেই আশ্চর্য একটা তথ্য আমরা পাই। এই উপন্যাসের একটি চরিত্র, জর্জ কিয়েন, যাকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষমান রাখা হয়েছে। কানেত্তি নিজেও ১৯৪৬ সালে নিজেই নিজেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩৫ বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে নোবেল পুরস্কারের জন্য। ১৯৩০-এর দশকে তিনি একে একে তাঁর নাটকগুলিও গড়ে তুলতে থাকেন। তাঁর প্রথম নাটক, Hochzeit / The wedding / বিবাহ। এই নাটকেই কানেত্তি নাটকের এক অনাবিষ্কৃত শক্তির সন্ধান দিলেন। কয়েকটা সাধারণদর্শন মানুষ কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে এক একটা দানব এক ধরনের উন্মত্ত তাণ্ডবে নিরত পরস্পরকে আত্মসাৎ করার জন্য। 'লোভ' যে কী জমাট নাট্যমূর্তি ধারণ করতে পারে এই নাটক তার এক আশ্চর্য উদাহরণ। এমন কি মানুষের যৌনসম্ভোগও লোভের থাবায় পণ্যবস্তু হয়ে গেছে। আবার চরিত্রগুলির আত্মধ্বংসের জন্য এমন অবিশ্বাস্য উন্মাদনা যে শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তি সম্ভব হল ভূমিকম্পের প্রসাদে। এই নাটক যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন তার ফলে সংঘটিত হল দাঙ্গা। বস্তুত কানেত্তি-র রচনা আমাদের সংসারে আচমকা এমন এক আঘাত যার ফলে রাস্তার রক্তারক্তি দাঙ্গা থেকে নানা প্রকার আধ্যাত্মিক রক্তক্ষরণ মোটেও অভাবিত নয়। তিনি তো এজন্য আমাদের যথেষ্ট সতর্ক করেও দিয়েছেন: "As a profession literature is destructive : one should have greater fear of words"—কানেত্তিই সম্ভবত সাহিত্যজগতের একমাত্র পুরুষ যিনি আমাদের অবহিত করলেন যে মানুষের জীবন ধ্বংসের জন্য উৎসর্গীকৃত নয় কিন্তু ধ্বংসের মধ্যেই আমাদের জীবন চিহ্নিত হয়ে থাকে।

The conscience of words/শব্দের বিবেক কানেত্তির চিন্তাধারার আর এক সংহত ভাস্কর্য। এই প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি তাঁর নিজস্ব ইতিহাসচেতনায় কয়েকজন ব্যক্তির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন—টলস্টয়, কাফকা ইত্যাদির। সময়ের স্রোত ও ব্যক্তিত্ব এমনভাবে আর

কোনো প্রবন্ধকারের কাছে ভাস্কর্যের বিষয় হয়েছে কিনা বলা কঠিন। কানেত্তির সৃষ্টি ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিশাল ও মহৎ কিন্তু সম্ভবত এখনো অসমাপ্ত। এই সমাপ্তির ধারণা অবশ্য এখনি আমাদের নেই। এটাও সম্ভবত আগামী অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তার জন্য খুব একটা খেদের কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ যা তিনি ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করেছেন তার তাৎপর্য নিয়ে আমরা এখনো বহু কাল কাটাতে পারি। সেই এক স্ববিরোধী চেতনা, যার নাম ইতিহাস, তার প্রকৃতি তিনি বড় কম উদ্ঘাটিত করেননি। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কালের যা সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা, ব্যক্তি জীবনে পারস্পরিক ছিন্নতা, তার মূলে অনাবৃত করার ব্যাপারে তিনি অনেকখানি সাহায্য আমাদের করেছেন যার ফলে এই যন্ত্রণার অপনোদনের আশা আমাদের মনে জাগে। তাঁর উপন্যাসকে ভিত্তি করেই তো সাহিত্যের একটা নতুন স্কুল গড়ে উঠেছে যার লেখকদের মধ্যে রয়েছেন গুন্টার গ্রাস, গিসেলা আইসনার প্রভৃতি। অবশ্য এইসব ছোট খাটো কৃতিত্ব তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা না করলেও চলে। কারণ তাঁর কৃতিত্বের কথা যদি বলতেই হয় তো সরাসরি এ কথা বলাই ভাল যে সার্ত্র-কে বাদ দিলে ইউরোপে সাহিত্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে সাম্প্রতিক কালে কেই-বা তাঁর তুল্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। সার্ত্রের দার্শনিক কাঠামো তাঁর চেয়ে পূর্ণতর হলেও সম্ভবত বৈজ্ঞানিক বিন্যাসে নয়। আগামী দশকগুলিতে সাহিত্যের দর্শনের পাশাপাশি দর্শনের সাহিত্যের নতুন মডেলের চাহিদা আমাদের জীবনে খুবই জরুরি হয়ে উঠবে। এই ব্যাপারে কানেত্তি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবেন বলেই মনে হয়। □

পত্রিকার পরিকল্পনা পর্যায়ে প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন গুরু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত এই লেখকের বর্তমান নিবন্ধটি এক দশক আগে 'চতুর্দিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।